স্টাডি ম্যাটেরিয়াল, 4th সেমিস্টার, ইতিহাস মেজর, NEP 2020 সিলেবাস

সুদীপ্ত সাধুখাঁ, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ

কৃষ্ণদেব রায়ের কৃতিত্ব,

কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্ব বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, যা সামরিক শক্তি, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতার এক বিরল সমন্বয়। তিনি ছিলেন তুলুবংশীয় তৃতীয় শাসক এবং তাঁর শাসনকালকে বিজয়নগরের স্বর্ণযুগ বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের মুসলিম সুলতানদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যুদ্ধে তাঁর বিজয়গাথা, পর্তুগিজদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উৎকর্ষতা তাঁকে এক অনন্য মর্যাদায় আসীন করেছে।

বিজয়নগর সাম্রাজ্য তখন পাঁচদিক থেকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। পশ্চিমে বিজাপুরের আদিলশাহী, উত্তর-পূর্বে বাহমনীদের উত্তরসূরি বিদারের বারিদশাহী, পূর্বে ওড়িশার গজপতি রাজবংশ, দক্ষিণে চোল-চেরদের প্রভাব এবং পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজ বণিকদের উপস্থিতি, সব মিলিয়ে এক জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। কৃষ্ণদেবরায় সুনিপুণ সামরিক কৌশলের মাধ্যমে একে একে শত্রুদের পরাজিত করে বিজয়নগরের শক্তি সুদৃঢ় করেন। তাঁর প্রথম বড়ো সামরিক সাফল্য আসে ১৫০৯ সালে, যখন তিনি বিজাপুরের সুলতান মাহমুদকে পরাজিত করে রায়চুর দোয়াব পুনর্দখল করেন। রায়চুর ছিল এক কৌশলগত ভূখণ্ড, যা কৃষ্ণদেবরায়ের সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। এই যুদ্ধে তিনি স্বয়ং সেনাপতিত্ব করেন, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের সেবা করেন, যা একজন শাসকের জন্য বিরল দৃষ্টান্ত।

পরবর্তীতে, ১৫১৩ সালে তিনি ওড়িশার গজপতি রাজা প্রভুদেব রায়কে পরাজিত করেন এবং উড়িষ্যার বহু দুর্গ দখল করেন। সম্রাটের শত্রুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোলকোন্ডার সুলতান কুলি কুতুব শাহ, যিনি ১৫১৮ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কৃষ্ণদেবরায় তাঁকে কঠোরভাবে দমন করেন এবং বিজয়নগরের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সাফল্য ছিল ১৫২০ সালের রায়চুরের দ্বিতীয় যুদ্ধ, যেখানে বিজাপুরের ইসমাইল আদিল শাহের বিরুদ্ধে এক

বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে কৃষ্ণদেবরায় ৭ লক্ষ পদাতিক, ৩২,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫৫০টি হাতির বিশাল বাহিনী নিয়ে লড়াই করেন। কথিত আছে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়া থেকে নেমে সৈন্যদের সাহস বাড়ানোর জন্য নিজেই অগ্রভাগে লড়াই করতেন। যুদ্ধ শেষে তিনি রায়চুর দুর্গ পুনর্দখল করেন এবং সমগ্র দাক্ষিণাত্যে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি ক্ষমতায় আসার পরই বাহমনী সুলতানাতের উত্তরসূরি রাজ্যগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। বাহমনী সাম্রাজ্যের পতনের পর নতুনভাবে গঠিত বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের মতো রাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছিল, যা কৃষ্ণদেব রায় তাঁর সুবিধামতো কাজে লাগান। ১৫০৯ সালে বাহমনী সুলতান মামুদ শাহ বিজয়নগর আক্রমণ করলে কৃষ্ণদেব রায় 'দোনি ও কোভেলা কোণ্ডার' যুদ্ধে বিজয়ী হন, যেখানে বিজাপুরের শাসক ইউসুফ আদিল শাহ নিহত হন। এই বিজয় বিজাপুর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, যার সুযোগ নিয়ে তিনি একের পর এক অঞ্চল দখল করেন। ১৫১২ সালে তিনি 'রায়চুর দোয়াব' দখল করে নেন, যা কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মাঝামাঝি অবস্থিত এক বিতর্কিত ভূখণ্ড ছিল। এরপর তিনি বিদর ও গুলবর্গা দখল করেন এবং বাহমনী সুলতান মামুদ শাহকে পুনরায় ক্ষমতায় বসিয়ে নিজের 'যবন রাজ্যস্থাপন আচার্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা, যাতে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এরপর তিনি দক্ষিণ-মহীশূরের বিদ্রোহী পলিগারদের দমন করেন। উচ্চ-কাবেরী উপত্যকায় শ্রীরঙ্গপত্তম ও শিবনসমুদ্রম দুর্গ দুটির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল, যা তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। কৃষ্ণদেব রায় দক্ষ সেনানায়কের মতো এই দুটি দুর্গ দখল করে বিদ্রোহ দমন করেন এবং নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে শ্রীরঙ্গপত্তমকে প্রতিষ্ঠা করেন। উড়িষ্যার গজপতি রাজ্যের সঙ্গে তার দীর্ঘমেয়াদী দ্বন্দ্ব ছিল। গজপতি প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের 'উদয়গিরি' ও 'কোণ্ডাভিডু' দখল করে রেখেছিলেন, যা পূর্ববর্তী বিজয়নগর রাজারা পুনর্দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৩ সালে উদয়গিরি ও ১৫১৪ সালে কোণ্ডাভিডু দখল করেন। কোণ্ডাভিডুর পতনের পর উড়িষ্যার যুবরাজ ও রানী বন্দি হন এবং বিজয়নগরে প্রেরিত হন। এরপর তিনি তেলেঙ্গানা আক্রমণ করেন, যেখানে সীতাব খাঁ গজপতি প্রতাপরুদ্রের সাহায্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণদেব রায় রাজামুন্ত্রী ও ভেঙ্গী দখল করেন এবং অবশেষে কটক আক্রমণ করতে উদ্যত হন। পরাজিত গজপতি প্রতাপরুদ্র শান্তির প্রস্তাব পাঠিয়ে নিজের কন্যাকে কৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিবাহ দেন।

কৃষ্ণদেব রায় যখন উড়িষ্যার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, তখন গোলকুণ্ডার শাসক কুলি কুতুব শাহ বিজয়নগরের কিছু দুর্গ দখল করে নেন। তিনি কৃষ্ণ-গোদাবরীর মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করার পর

কোণ্ডাভিডু দুর্গও ছিনিয়ে নেন। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় দ্রুত তার বাহিনী পাঠিয়ে কোণ্ডাভিডুর দুর্গাধিপতি সালুভ তিম্মার নেতৃত্বে গোলকুণ্ডার বাহিনীকে বিতাড়িত করেন।

তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল বিজাপুর সুলতান ইসমাইল আদিল শাহের বিরুদ্ধে। ১৫১২ সালে যখন তিনি রায়চুর দখল করেন, তখন ইসমাইল আদিল শাহ ছিলেন নাবালক। কিন্তু সাবালক হওয়ার পর তিনি রায়চুর পুনর্দখলের চেষ্টা করেন এবং ১৫২০ সালে কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যার সঙ্গে ব্যস্ত থাকার সুযোগে দুর্গটি দখল করেন। কৃষ্ণদেব রায় প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন এবং রায়চুর পুনরুদ্ধার করেন। ইসমাইল আদিল শাহ এরপর রায়চুর ফেরতের দাবি জানালে কৃষ্ণদেব তাকে অপমানজনক শর্ত দেন—তিনি রাজা কৃষ্ণদেবের পদচুম্বন করলে দুর্গ ফেরত দেওয়া হবে। আদিল শাহ শেষ পর্যন্ত রাজি হননি এবং পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেন। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষ্ণদেব রায় বিশাল বাহিনী নিয়ে বিজাপুর আক্রমণ করেন এবং সেখানে তুমুল যুদ্ধের পর গুলবর্গা দখল করেন। পর্যটক নুনিজের বিবরণ অনুসারে, তিনি গুলবর্গার দুর্গ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন। এরপর তিনি বাহমনী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গুলবর্গার শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন, যাতে বাহমনী সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ টিকিয়ে রাখা যায় এবং মুসলিম রাজ্যগুলোর মধ্যে পারস্পরিক লড়াই অব্যাহত থাকে। এটি তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন, যা বিজয়নগরকে দীর্ঘদিন শক্তিশালী করে রেখেছিল।

তাঁর প্রশাসন ছিল অত্যন্ত সংগঠিত ও কার্যকর। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি করেন, অযৌক্তিক কর বাতিল করেন এবং কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একাধিক খাল খনন করেন, যার মধ্যে পেন্নার ও কৃষ্ণা নদীর উপর নির্মিত সেচব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর, যা পর্তুগিজ পর্যটক ডোমিংগো পেস ও ফেরনাও নুনিজের বিবরণে উঠে এসেছে। পেস লিখেছেন, রাজ্যের সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা এত সুদৃঢ় যে রাতের বেলাতেও কোনো যাত্রী কোনো ভয় ছাড়াই চলাচল করতে পারে। সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি কৃষ্ণদেবরায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর শাসন কালে তেলুগু সাহিত্য তার স্বর্ণযুগে প্রবেশ করে। তিনি নিজেই আমুক্তমাল্যদা নামে একটি তেলুগু মহাকাব্য রচনা করেন, যেখানে আন্ধ্রদেশের ভক্তি আন্দোলন ও রামানুজাচার্যের জীবনচর্যা বিবৃত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং মদালসা চরিত ও জাম্ববতী কল্যাণ রচনা করেন। তাঁর রাজসভায় অষ্টদিগগজ নামে পরিচিত আটজন বিখ্যাত তেলুগু কবির উপস্থিতি তেলুগু সাহিত্যকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। এছাড়াও তিনি কন্নড় ও তামিল সাহিত্যেরও অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুকু তিম্মানা, আল্লাসানি পদ্মনাভ, তেনালি রামকৃষ্ণ প্রমুখ সাহিত্যিক তাঁর সভার গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

স্থাপত্যকলায় কৃষ্ণদেবরায়ের অবদান অপরিসীম। তিনি বহু মন্দির, গোপুরম ও মণ্ডপ নির্মাণ করেন, যার মধ্যে হাজারা রামস্বামী মন্দির, রামস্বামী মন্দির এবং বিঠলস্বামী মন্দির উল্লেখযোগ্য। তাঁর আমলে হাম্পির স্থাপত্য এক নতুন রূপ লাভ করে, যা আজও ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে সংরক্ষিত। তাঁর জীবনের শেষ পর্ব ছিল দুঃখময়। ১৫২৪ সালে তিনি তাঁর পুত্র তিরুমালা রায়কে যুবরাজ ঘোষণা করেন, কিন্তু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুবরাজকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সন্দেহ গিয়ে পড়ে, ফলে কৃষ্ণদেবরায় তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী তিম্মারুসুকে অন্ধ করে দেন। এই ঘটনার পর তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং ১৫২৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ভাই অচ্যুতদেবরায়কে উত্তরসূরি মনোনীত করেন, তবে তাঁর মৃত্যুপরবর্তী সময়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করে। কৃষ্ণদেবরায় একাধারে ছিলেন দক্ষ শাসক, কৌশলী সেনাপতি, সুসংগঠিত প্রশাসক, বিদগ্ধ সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতির মহান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর শাসনকাল দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাষ্ট্রনীতির পুনরুজ্জীবন ও সামরিক শক্তির সর্বোচ্চ উত্থানের প্রতীক। তাঁর স্মৃতি আজও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তালিকোটার যুদ্ধ,

বানিহাটির বা তালিকোটার যুদ্ধ হয়েছিল ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এই যুদ্ধ হয়েছিল বিজয়নগরের সঙ্গে বাহমনি রাজ্যের উত্তরসূরি পাঁচটি সুলতানি রাজ্যের (আহমেদনগর, বিজাপুর, বেরার, গাোলকুণ্ডা এবং বিদর) মিলিত শক্তির মধ্যে। ১৫শ শতকের মধ্যভাগে বিজয়নগর সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে হিন্দু শক্তির প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। দেবরায় দ্বিতীয় ও কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে বিজয়নগর তার ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছায়। কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তার ভাইয়ের পুত্র সাদাশিব রায় নামমাত্র শাসক থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করতেন তৎকালীন মন্ত্রী রাম রাজা (রাম রায়)। তিনি একাধিকবার দাক্ষিণাত্য সুলতানদের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং মুসলিম সুলতানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে বিজয়নগরের প্রভাব বিস্তার করেন। তবে রাম রায়ের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও তার মুসলিম রাজ্যগুলোর প্রতি আগ্রাসন দাক্ষিণাত্য সুলতানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে। বিশেষত, রাম রায় বিজাপুরের সুলতান আলী আদিল শাহ ও গোলকোন্ডার সুলতান ইব্রাহিম কুতুব শাহের বিরুদ্ধে একাধিকবার সামরিক অভিযান চালান। তিনি মুসলিম সেনাপতিদেরও ব্যবহার করতেন, যা সুলতানদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। এই রাজনৈতিক বাস্তবতায় দাক্ষিণাত্যর চারটি প্রধান সুলতানাত (বেরার বাদে) বিজয়নগরের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ জোট গঠন করে।

১৫৬৫ সালের জানুয়ারিতে বিজাপুর, গোলকোন্ডা, আহমদনগর ও বিডারের সম্মিলিত বাহিনী তালিকোটা নামক স্থানে বিজয়নগরের শক্তিশালী বাহিনীর মুখোমুখি হয়। রাম রায়ের নেতৃত্বাধীন বিজয়নগর বাহিনী শুরুতে বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিল। তার নেতৃত্ব দক্ষ ছিল এবং যুদ্ধের প্রথম অংশে তিনি শত্রু বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। কিন্তু যুদ্ধের ভাগ্য বদলে যায় বিজয়নগর বাহিনীর মুসলিম সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতায়। তারা যুদ্ধের মাঝপথে শত্রু পক্ষের সাথে যোগ দেয়, ফলে বিজয়নগর বাহিনীর রণকৌশল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। রাম রায় যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হন এবং সুলতানদের আদেশে হত্যা করা হয়। এই মুহূর্তেই বিজয়নগর বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, এবং সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের পরাজয় একটি গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা ছিল। যুদ্ধের পর মুসলিম সুলতানদের বাহিনী বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পি দখল করে এবং ভয়াবহ লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। শহরের মন্দির, প্রাসাদ ও অমূল্য স্থাপত্যকীর্তি ধ্বংস করা হয়, যা একসময় দক্ষিণ ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ নগরী ছিল। যদিও বিজয়নগর সাম্রাজ্য এই যুদ্ধের পরপরই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি, তবে এটি আর কখনো তার পূর্বের শক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। পরে রাজধানী পেনুকোন্ডায় স্থানান্তরিত হলেও, সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কয়েক দশকের মধ্যে পুরোপুরি পতনের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে, দাক্ষিণাত্যের মুসলিম সুলতানিগুলোও নিজেদের মধ্যকার শত্রুতা পুনরায় শুরু করে এবং দীর্ঘমেয়াদে কোনো একক শক্তি দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি।

এর ফলে প্রথমতঃ বাহমনী সাম্রাজ্যের পতনের পর বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর, বেরার ও বিদর—এই পাঁচটি রাজ্যের উত্থান ঘটে। ১৫৬৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধে এই পাঁচটি রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনীর (শুধুমাত্র বেরার বাদে) কাছে বিজয়নগর চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধকে ইতিহাসবিদ ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বিজয়নগরের মৃত্যু-ঘন্টা বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের পরাজিত মন্ত্রী রাম রায় আহমদনগরের সুলতান হুসেন নিজাম শাহের হাতে নিহত হন। এই ঘটনার পর থেকে বিজয়নগরের গৌরব ও প্রতিপত্তি দ্রুত ক্ষয় হতে থাকে এবং রাজ্যটি ক্রমশ পতনের দিকে ধাবিত হয়। এই পতনের ফলে দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্যে কোনো শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্যের উত্থান সম্ভব হয়নি।

তৃতীয়তঃ ঐতিহাসিক ফেরিস্তার বিবরণ অনুযায়ী, এই যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ হিন্দু নিহত হয়। Sewell তাঁর ‘A Forgotten Empire’ গ্রন্থে লিখেছেন যে, বিজয়ী বাহিনী নির্মমভাবে হিন্দুদের হত্যা করে, মন্দির, দেবমূর্তি ও রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করে। তাঁর মতে, পৃথিবীর ইতিহাসে এত ভয়াবহ ধ্বংসলীলা বিরল।

চতুর্থতঃ বিজয়ী মুসলিম রাজ্যগুলোর সম্মিলিত বাহিনী পাঁচ মাস ধরে বিজয়নগরে ব্যাপক লুণ্ঠন চালায়। সৈন্যরা বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষ সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। লুণ্ঠনের ফলে সমগ্র বিজয়নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

পঞ্চমতঃ বিজয়নগরের পতনের পর পাঁচটি মুসলিম রাজ্যের মধ্যেও বিরোধ ও সংঘর্ষ শুরু হয়, যা তাদের দুর্বল করে ফেলে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তাদের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়।

বিজয়নগরের কৃষি ব্যবস্থা

বিজয়নগরের কৃষিব্যবস্থা ছিল একটি পরিপূর্ণ কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি, যেখানে কৃষি উৎপাদনই ছিল মানুষের প্রধান জীবিকা। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে, বিজয়নগরের বৃহত্তম জনগণ গ্রামে বসবাস করত এবং ভূমি ছিল তাদের সামাজিক মর্যাদার মূল সূচক। জমির মালিকরা উচ্চ সামাজিক অবস্থান লাভ করতেন, তবে গ্রামগুলিতে কৃষক ও ভূস্বামীর মধ্যে শ্রেণীভেদ স্পষ্ট ছিল। এখানে জমির মালিকদের সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত অসম, এবং তাদের অবস্থা প্রায়ই ভূমিদাসদের সমতুল্য ছিল।

বিজয়নগরে, বিশেষত মঠ এবং মন্দিরের জমি, বর্গাচাষে ব্যবহার হত। বর্গাদাররা জমির আংশিক মালিকানা লাভ করতেন, ফলে তাদের জীবিকা একদিকে যেমন কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল, অন্যদিকে জমির মালিকদের জন্য আয়ের উৎস ছিল। এই ব্যবস্থায়, অনেক কৃষক তাদের জীবিকার জন্য জমির মালিকদের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং জমির মালিকেরা তাদের শর্তে কাজ করাতেন। এই বর্গাচাষ প্রথা শাসক শ্রেণির জন্য আয় নিশ্চিত করলেও কৃষকরা প্রায়ই অশান্তি ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতো। এছাড়া, বিজয়নগরের কৃষির বৈচিত্র্য ছিল উল্লেখযোগ্য। খাদ্যশস্য ও ডাল জাতীয় শস্যের পাশাপাশি ফুল, ফল, এবং কাঁচা আনাজের উৎপাদনও ব্যাপক ছিল। বিশেষত, গোলাপের চাষ উল্লেখযোগ্য ছিল এবং আবদুর রজ্জাকের মত পর্যটকরা এই বিষয়টি চিহ্নিত করেছিলেন, যেখানে গোলাপ ছিল সাধারণ জীবনযাত্রার অংশ। কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং সুষম বণ্টনের জন্য জলসেচ ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। নদী, খাল ও জলাশয় খনন করে কৃষি জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কৃষকদের সহায়তার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষও উৎসাহিত করত, বিশেষত অনাবাদী জমি চাষের জন্য কৃষকদের করের বোঝা লাঘব করার মাধ্যমে।

যদিও কৃষকরা সাধারনত স্বাভাবিক অর্থনৈতিক সুবিধা পেতেন না, কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন মঠ বা মন্দিরে কৃষকদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। এখানে জমির মালিকানাধীন কর্তৃপক্ষ

কৃষকদের উপর বেশ সহনশীল ছিল, যা তাদের জীবনযাত্রাকে কিছুটা সহজ করেছিল। তবে, অভিজাত শ্রেণির অধীনে কাজ করা কৃষকদের জন্য জীবন ছিল কঠিন, কারণ তাদের উপর করের বোঝা ছিল অত্যন্ত ভারী। গো-পালন এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনও ছিল বিজয়নগর রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ খাত। গো-চারণের জন্য নির্দিষ্ট জমি ছিল, এবং মঠ ও মন্দির কর্তৃপক্ষের অধীনে গবাদি পশু পালন করা হত। কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত এই খাতগুলি রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বিজয়নগরের কর কাঠামো

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কর ব্যবস্থা ছিল একেবারে জটিল ও সুসংহত, যার মধ্যে ভূমি-রাজস্ব ছিল প্রধান উৎস। এই রাজস্ব প্রথা শুধুমাত্র জমির পরিমাণ বা উৎপাদনের ওপর নির্ভর করত না, বরং বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য উপাদানও বিবেচনায় নেওয়া হত। যেমন, জমির চরিত্র—সেচযোগ্য বা অ-সেচযোগ্য—এবং জমি দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়েছে কিনা, এসব বিষয়ও ছিল কর নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি একে বিভিন্ন অঞ্চলের উর্বরতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারণ করা হত। যেমন, ব্রাহ্মদেয় জমি ও মন্দির জমির জন্য আলাদা কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। রাজা কৃদেব রায়ের আমলে জমি জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব নির্ধারণের প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালিত হত, যাতে উৎপাদন পরিমাপের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অসামঞ্জস্য না ঘটে। তবে, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, বিজয়নগরের রাজস্ব ব্যবস্থা বেশ ভারী ছিল এবং প্রজাদের ওপর করের বোঝা ছিল প্রচণ্ড।

বিজয়নগর রাজ্যটির কর ব্যবস্থায় শুধু ভূমি-রাজস্বই ছিল না, সামাজিক ও পেশাভিত্তিক করও আদায় করা হত। গ্রামে গ্রামে প্রচলিত বিভিন্ন পেশার জন্য, যেমন মোড়ল, মেষপালক, ছুতোর, ধোপা, নাপিত ইত্যাদি, পেশাভিত্তিক কর ধার্য করা হত। এক সময়, বিশেষ কিছু শ্রেণির মানুষ যেমন নাপিতদের কর প্রদান থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্যও কর আদায় করা হত, যেমন রাজা বা রাজ পরিবারের নতুন পুত্র সন্তানের জন্ম হলে, সমগ্র সামন্ত ও স্থানীয় নেতাদের পক্ষ থেকে বিশেষ ধরনের কর প্রদান করা হত। এই ধরনের সামাজিক কর সংগ্রহের ব্যবস্থা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে রাষ্ট্রের এক ধরনের শাসন এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ব্যবস্থা বজায় রাখার প্রচেষ্টা ছিল। এছাড়া, 'উলিয়াম' নামে একটি বেগার শ্রমের প্রথা বিজয়নগর সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল, যেখানে স্থানীয় মানুষকে বিনা মজুরীতে শ্রম দিতে বাধ্য করা হত। রাস্তা নির্মাণ, জলসেচ ব্যবস্থা স্থাপন, দুর্গ নির্মাণ—এসব কাজের জন্য স্থানীয় জনগণের বাধ্যতামূলক শ্রম গ্রহণ করা হত। বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অনাবৃষ্টি, কৃষকদের জন্য কর মওকুফ করার ব্যবস্থা ছিল।

এই ধরনের কর মওকুফের ক্ষমতা ছিল রাজা বা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, যা শাসন ব্যবস্থা এবং তার সামর্থ্যকে প্রদর্শন করত।

রাজস্ব দপ্তরটির নাম ছিল 'অথবান', যা রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করত। এই দপ্তরটি রাজ্যের প্রতিটি অংশে বিভক্ত ছিল, যেখানে প্রদেশ এবং জেলা স্তরের কর্মচারীরা স্থানীয় রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। রাজস্ব সংগ্রহের চারটি প্রথা ছিল—সরকারের কর্মচারীরা সরাসরি কৃষক বা উৎপাদকের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন, অথবা কর সংগ্রহের দায়িত্ব কোনও ব্যক্তির হাতে ইজারা দেওয়া হত, আবার কিছু গ্রাম বা গোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে কর আদায় করতেন। সব মিলিয়ে, বিজয়নগরের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল এক অত্যন্ত উন্নত, কিন্তু কঠোর ব্যবস্থাপনা যা রাজ্যের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শাসক শ্রেণীর শক্তি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বিজয়নগরের নায়ঙ্কারা প্রথা

বিজয়নগর রাজ্যের সামরিক ব্যবস্থা ও ভূমি ব্যবস্থার সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিল 'নায়ক' বা 'নায়ঙ্কারা' প্রথা, যা রাজ্যটির অভ্যন্তরীণ শাসন ও সামাজিক কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 'নায়ক' শব্দটির সংস্কৃত অর্থ নেতা বা বিশিষ্ট ব্যক্তি, কিন্তু বিজয়নগরে এর অর্থ ছিল সামরিক নেতা এবং স্থানীয় প্রশাসক। এই প্রথার মাধ্যমে রাজা স্থানীয় অঞ্চলের শাসনকারীদের ভূমি প্রদান করতেন, যারা সেনাপতি, প্রশাসক, ও সরকারি কাজের জন্য রাজ্যের সাহায্য দিতেন। বিজয়নগরের ইতিহাসে 'নায়ক' শব্দটির ব্যবহারে একাধিক ব্যাখ্যা এসেছে, বিশেষ করে পন্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ের বিশ্লেষণে, যেখানে নায়করা একদিকে ছিলেন রাজ্যের সেনাপতি, অন্যদিকে স্থানীয় শাসক, যাদের ভূমি অধিকার ছিল এবং যারা রাজস্ব সংগ্রহে যুক্ত ছিলেন।

১৯৪৬ সালে শাস্ত্রী প্রথম বলেছিলেন যে, বিজয়নগরের নায়করা রাজা উপর নির্ভরশীল ছিল, তবে ১৯৬৪ সালে তিনি এই মত পরিবর্তন করেন এবং বলেন যে, বিজয়নগর ছিল একটি যোদ্ধারাজ্য, যেখানে সামরিক নেতা ও ভূমি অধিকারী ব্যক্তিরা একত্রে রাজ্যের শাসন পরিচালনা করতেন। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, বিজয়নগর একটি কেন্দ্রীভূত সামরিক রাষ্ট্র ছিল, যেখানে রাজা সামরিক নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বিজয়নগরের এই রাজনৈতিক কাঠামোকে **'Segmentary State'** বা বিভক্ত রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসকরা, নায়করা, বিভিন্নভাবে স্বাধীনভাবে শাসন চালাতেন, কিন্তু সবই রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ছিল।

প্রথাটির মূল ভিত্তি ছিল ভূমি ও উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ। নায়কদের ভূমি প্রদান এবং রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল একান্তভাবে সামরিক প্রয়োজনের সাথে যুক্ত। নায়করা শাসনাধীন এলাকায় কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে, যা কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিত। বিশেষভাবে তামিল অঞ্চলে, যেখানে তেলেগু যোদ্ধাদের উপস্থিতি ছিল, নায়করা কৃষকদের শোষণ করতেন এবং ভূমি ব্যবহার করে রাজস্ব বৃদ্ধি করতেন। এই ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসক ক্ষমতার সাথে সমন্বিত থাকলেও, নায়কদের প্রায় স্বাধীন শাসনক্ষমতা ছিল।

এছাড়া, বিজয়নগর রাজ্যের সামরিক ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। চোল যুগে ব্রাহ্মণরা জমি দেওয়ার মাধ্যমে স্থানীয় শাসনে অংশগ্রহণ করত, কিন্তু বিজয়নগরের সময়ে ব্রাহ্মণরা সরাসরি সামরিক নেতারূপে কাজ শুরু করেন এবং রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি, অন্য ধর্মীয় ও সামরিক সম্প্রদায়ও এই ব্যবস্থায় যুক্ত ছিল।

তবে, এই ব্যবস্থার মধ্যে এক ধরনের কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা ছিল। জমি ও রাজস্ব আদায়, যা নায়করা করতেন, তা রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যদিও নায়কদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু স্বাধীনতা ছিল। বিশেষত, বিজয়নগরের নায়করা কোনো স্বীকৃত মধ্যবর্তী স্তরের প্রয়োগ ছাড়াই, এককভাবে জমি নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং এই ব্যবস্থার সাথে জাপানের সামন্ততন্ত্রের কিছু মিল থাকলেও, তাতে স্পষ্ট পার্থক্যও ছিল।

বিজয়নগর রাজ্য ছিল এক ধরনের যুদ্ধরাষ্ট্র বা 'War State', যেখানে সামরিক শক্তি ছিল মূল কাঠামো, এবং রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ছিল একেবারে সামরিক নির্ভর। এর ফলে, নায়করা সশস্ত্র বাহিনীর অংশ হিসেবে রাজ্যের শাসন পরিচালনা করতেন, এবং সামরিক নেতা ও জমির মালিকদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক নির্ভরশীল।

অতএব, 'নায়ক' প্রথা বিজয়নগরের রাজনৈতিক ও সামরিক কাঠামোকে একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত করেছিল, যেখানে ভূমির অধিকার, রাজস্ব আদায় এবং সামরিক শক্তির মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, যা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বিজয়নগর

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বিজয়নগর সাম্রাজ্য বহু পর্যটক ও দূতের আগমনের সাক্ষী ছিল। এই সাম্রাজ্যের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, যা মধ্যযুগীয় ভারতের চিত্র বোঝার জন্য অমূল্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কোন্টি (Nicolo Conti) ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য পরিদর্শন করেন। নগরীর বিশালতা ও শক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, নগরীর পরিধি ষাট মাইল বিস্তৃত। এর প্রাচীর পর্বত পর্যন্ত প্রসারিত এবং পর্বতের পাদদেশে উপত্যকাগুলিকে বেষ্টন করেছে। ...অস্ত্র ধারণে সক্ষম প্রায় নব্বই হাজার লোক এই শহরে বাস করে। এর রাজা ভারতের সকল রাজা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। তাঁর বর্ণনায় বিজয়নগরের সামরিক শক্তি ও নগর পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরবর্তী পর্যটকদের মধ্যে পারসিক রাজদূত আবদুর রজ্জাক অন্যতম। ১৪৪২-৪৮ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগর সফরকালে তিনি লক্ষ্য করেন যে রাজ্যের সম্পদ ও জনসংখ্যা অভূতপূর্ব। তিনি বলেন, এই রাজ্যের জনসংখ্যা এত বেশী যে স্বল্প পরিসরে তার সম্যক ধারণা দেওয়া যায় না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে রাজ্যের কোষাগারে স্বর্ণ মজুত রাখার জন্য প্রকোষ্ঠগুলিতে গর্ত খনন করে তাতে গলিত স্বর্ণ ঢেলে রাখা হতো। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, সাধারণ জনগণ পর্যন্ত স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করত, যা রাজ্যের বিত্ত-বৈভবের প্রতিফলন। সামরিক শক্তির বিষয়ে তিনি বলেন, বিজয়নগরের ১১ লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী ছিল। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তিনি উল্লেখ করেন যে রাজ্যের ৩০০ বন্দর ছিল, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। নগরীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, বিজয়নগরের ন্যায় একটি নগরী বিশ্বের অন্যত্র কোথাও আছে বলে দেখা যায় নি। একটির মধ্যে একটি, এইরূপে সাতটি প্রাচীর দ্বারা নগরীটি সুরক্ষিত ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য শাসকদের তুলনায় বিজয়নগরের রাজাকে তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী হিসেবে চিত্রিত করেন।

পর্তুগিজ পর্যটক পায়েস (Paes) বিজয়নগরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কৃষি ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। তিনি বলেন, বিশ্বের মধ্যে এই নগরী সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। এখানে চাল, গম, শস্য, ভুট্টা, প্রচুর পরিমাণে যব এবং নানা প্রকার ডাল, অশ্বের খাদ্য ও অন্যান্য শস্যবীজ প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। তাঁর বিবরণে নগরীর বাজার ও পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তারিত চিত্র উঠে আসে। তিনি উল্লেখ করেন, রাস্তাঘাট ও বাজারে অগণিত ভারবাহী বলদ দেখা যায়। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, বাণিজ্যের দিক থেকে বিজয়নগর ছিল আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন শহর, যেখানে বিভিন্ন জাতির ও দেশের মানুষ সমবেত হতো।

১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগর সফরকারী পর্তুগিজ পর্যটক এডোয়ার্ডো বারবোসা (Eduardo Barbosa) শহরটির বানিজ্যিক গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, বিজয়নগর ছিল বিশাল, জনবহুল এবং দেশীয় হীরা, পেগুর চুনী, চীন ও আলেকজান্দ্রিয়ার রেশম এবং মালাবারের সিঁদুর, কপূর, কস্তূরী, গোলমরিচ ও চন্দনের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। এই বিবরণে বিজয়নগরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নেটওয়ার্ক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চিত্র ফুটে ওঠে।

এছাড়া, কৃষ্ণদেব রায়ের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রশংসা করে তিনি বলেন, রাজা খ্রিস্টান, ইহুদী, মুর (মুসলমান) বা হিন্দু নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখানে যাওয়া আসা করার এবং বিনা বাধায় নিজ ধর্ম পালন করে বসবাস করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এই পর্যবেক্ষণ মধ্যযুগীয় ভারতে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, বিজয়নগর শুধুমাত্র সামরিক শক্তি ও নগর পরিকল্পনায় নয়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বাণিজ্য ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রেও অন্যতম শীর্ষস্থানে ছিল। এই বিবরণগুলো মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস বোঝার জন্য অমূল্য সূত্র হিসেবে কাজ করে। এই সকল বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে বিজয়নগরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এক উজ্জ্বল চিত্র উঠে আসে। এটি মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম ধনী ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। নিকলো কন্টি শহরটির বিশালতা ও সৈন্যবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন, যেখানে ৯০ হাজার অস্ত্রধারী পুরুষ ছিল। আবদুর রজ্জাক বিজয়নগরের জনঘনত্ব ও রাজকোষের সোনা-পূর্ণ প্রকোষ্ঠগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। ডোমেনিগো পায়েজ একে বিশ্বের অন্যতম সেরা শহর হিসেবে বর্ণনা করে, এখানকার বাণিজ্য ও বাজারগুলির সমৃদ্ধির বিবরণ দিয়েছেন। বারবোসা শহরের বিস্তৃতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথা বলেছেন, যেখানে চীন, আলেকজান্দ্রিয়া, মালাবার ও পেগুর সঙ্গে ব্যবসা চলত।

বিজয়নগরের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। পায়েজ জানাচ্ছেন, এখানে প্রচুর ধান, শস্য ও কার্পাস উৎপাদিত হত। রাজারা কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছিলেন, নতুন জমি চাষযোগ্য করা এবং সেচব্যবস্থার উন্নয়নে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ভূমি-রাজস্ব ছিল প্রধান সরকারি আয়, যা উৎপন্ন শস্যের একষষ্ঠাংশ থেকে একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত হত। রাজস্ব ব্যবস্থার ভিন্নতা ছিল শস্য, ভূমির প্রকৃতি ও সেচের ওপর নির্ভরশীল।শিল্পের মধ্যে বস্ত্র, ধাতু ও সুগন্ধ দ্রব্য উৎপাদন ছিল উল্লেখযোগ্য। বিজয়নগর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আবদুর রজ্জাক তিনশো বন্দরের কথা বলেন, যেখানে কালিকট প্রধান ছিল। ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীন, আরব, পারস্য, আফ্রিকা ও পর্তুগালের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য চলত। প্রধান রপ্তানি সামগ্রী ছিল বস্ত্র, মসলা, চাল, চিনি ও

ধাতু; আর আমদানি করা হত ঘোড়া, হাতি, তামা, পারদ ও প্রবাল। স্থল ও জলপথে বাণিজ্য চলত, বিজয়নগরের নিজস্ব জাহাজ নির্মাণশিল্পও ছিল। তবে শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনে শাসকরা তেমন গুরুত্ব দেননি।

শহরের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ছিল বণিকসংঘ বা গিল্ড, যা বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনা করত। পায়েজ ও আবদুর রজ্জাক ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধ কাঠামোর কথা বলেছেন। অর্থনৈতিক লেনদেনে প্রধানত সোনার মুদ্রা ব্যবহৃত হত, যার ওপর দেবদেবীর প্রতিমা ও পশু-পাখির ছবি উৎকীর্ণ থাকত। অভিজাত ও মধ্যশ্রেণির লোকেরা বিলাসী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণির জনগণ করের বোঝা বহন করত। সাধারণ মানুষ দরিদ্র হলেও, দারিদ্র্যের চূড়ান্ত কষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি। তবে আলেকজান্ডার নিকিতিন গ্রামাঞ্চলের মানুষের শোচনীয় অবস্থার কথা বলেছেন। ডঃ সতীশচন্দ্র মনে করেন, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ কৃষকদের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিফলিত করে না, কারণ তারা গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তবুও, বাহমনী রাজ্যের তুলনায় বিজয়নগরের অর্থনীতি ছিল স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ।

বাহমনি রাজ্যের ইতিহাস

বাহমনি সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা দিল্লির তুঘলক সাম্রাজ্যের পতনের পটভূমিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ (যিনি হাসান গাঙ্গু নামেও পরিচিত) বাহমনি সুলতানি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটি ১৫২৬ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এটি ছিল দক্ষিণ ভারতে প্রথম স্বাধীন মুসলিম রাজ্য। এর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘ সময় ধরে উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। তবে পরবর্তী সময়ে বাহমনি রাজ্যটি পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, যা দক্ষিণ ভারতের পাঁচ শাহী রাজ্য নামে পরিচিত—বিজাপুর, গোলকুন্ডা, আহমদনগর, বিদর ও বেরার।

১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হাসান গাঙ্গু দিল্লির সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের একজন সেনাপতি ও দাক্ষিণাত্যের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। দিল্লি সুলতানির অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের মুসলিম ও হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে অসন্তোষ জন্ম নেয়, যার সুযোগ নিয়ে হাসান গাঙ্গু বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং দিল্লির শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাহমনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা সুসংহত করতে সমকালীন সুফি সাধকদের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষত গেসু দরাজ ও অন্যান্য সুফি সাধকদের আশীর্বাদ ও আনুগত্য তাঁর শাসনের বৈধতাকে শক্তিশালী করে তোলে। এই সুফি প্রভাব বাহমনি রাজ্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশেও গভীর

ছাপ ফেলে। হাসান গাঙ্গুর রাজ্য আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মূলত কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। প্রথম রাজধানী হিসেবে তিনি দৌলতাবাদকে নির্বাচন করেন, কিন্তু পরবর্তীতে গুলবার্গাকে রাজধানী করেন। পরবর্তী শাসকরা আবার বিডারকে রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করেন। বাহমনি সুলতানরা দিল্লি সুলতানির প্রশাসনিক কাঠামোর অনুকরণে একটি সংগঠিত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সাম্রাজ্যকে চারটি প্রদেশ বা তরফ (Daulatabad, Gulbarga, Bidar, Berar) এ বিভক্ত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি তরফের শাসক ছিলেন তরফদার। পরবর্তীকালে মহম্মদ গাওয়ানের সময় এটি আটটি তরফে বিভক্ত হয় এবং তিনি তরফদারদের ক্ষমতা হ্রাস করতে একটি অংশকে সরাসরি সুলতানের নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। প্রতিটি তরফকে আবার 'সরকার' ও 'পরগনা'-তে বিভক্ত করা হয়েছিল। পরগনা স্তরে কোতওয়াল, দেশমুখ ও দেশাই প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করত।

সুলতান ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। তাঁর অধীনে ছিল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ— যেমন বাকিল-উস-সুলতান, যেটি দিল্লি সুলতানির নায়েবে সুলতানের সমতুল্য ছিল। পেশোয়া ছিল ভকিলের সহযোগী আর ওয়াজির-ই-কুল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতেন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধান করতেন।আমির-ই-জুমলা ছিল অর্থ বিভাগের প্রধান। অন্যদিকে ওয়াজির আশরাফ পররাষ্ট্র ও রাজকীয় সভার প্রধান, সদর-ই-জাহান বিচার ও ধর্মীয় অনুদান বিভাগের প্রধান এবং কোতওয়াল পুলিশ বিভাগের প্রধান হিসেবে ছিল।

বাহমনি সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বেশ সুসংগঠিত ছিল। সুলতান ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। বাহিনীতে প্রধানত পায়ে চলা সৈন্য (Infantry), অশ্বারোহী সৈন্য (Cavalry), যুদ্ধহাতি ও কামান ছিল। আমির-উল-উমরাহ ছিলেন সেনাপ্রধান এবং দুর্গগুলোর রক্ষার জন্য কিলেদার নিযুক্ত থাকত। সামরিক বাহিনীতে মনসবদারি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যেখানে সেনাধ্যক্ষরা তাদের মর্যাদা অনুযায়ী জমিদারি পেতেন।

তাজউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২) ছিলেন বাহমনি সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি বিজয়নগর সম্রাট প্রথম দেবরায় এর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি ভীমা নদীর তীরে ফিরোজাবাদ শহর স্থাপন করেন। এর পরের শাসক আহমদ শাহ বাহমনি (১৪২২-১৪৩৫) ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয় শাসক, যিনি ওয়ারঙ্গলের কাজী নায়ক বংশকে পরাজিত করেন। তিনি রাজধানী গুলবার্গা থেকে বিদরে স্থানান্তর করেন। অন্যদিকে মহম্মদ গাওয়ান ছিলেন এক পারসিক বণিক, যিনি পরে বাহমনি সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁর দক্ষ প্রশাসনিক ও সামরিক নীতির ফলে বাহমনি সাম্রাজ্য তার চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে। তিনি

অর্থনীতি সংস্কার করেন, করব্যবস্থা সংশোধন করেন এবং সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্যোগে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটে এবং বিদরে বিখ্যাত মাদ্রাসা মহম্মদ গাওয়ান প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দরবারের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁকে ১৪৮১ সালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, যার ফলে বাহমনি সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়।

বাহমনি সাম্রাজ্যের মূল আয় কৃষি থেকে আসত। রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান ছিলেন আমির-ই-জুমলা। কৃষিজমির এক-তৃতীয়াংশ কর হিসেবে আদায় করা হত। অন্যান্য করের মধ্যে ছিল আবাসন কর, খনিজ কর, তামাক কর, বাণিজ্য কর ও চাকরির ওপর কর। রাজস্ব থেকে সেনাবাহিনী, রাজদরবার ও জনকল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হত। বাহমনি স্থাপত্যে পারসিক ও ভারতীয় শিল্পশৈলীর সংমিশ্রণ দেখা যায়। বিদর ও গুলবর্গা ছিল স্থাপত্যশিল্পের কেন্দ্র। উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে—গুলবর্গা দুর্গ, জামে মসজিদ, হাফত গুম্বজ, মাদ্রাসা মহম্মদ গাওয়ান, বিদার দুর্গ।

এই বিবরণ বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক গ্রিবল তাঁর **History of the Deccan** গ্রন্থে বলেছেন, **But there is no evidence of oppressive exactions from their subjects even in times of war** কিন্তু কোথাও প্রজাগণের কাছ থেকে, এমন কি যুদ্ধের সময়েও জোর করে কোনো কিছু আদায়ের প্রমাণ নেই।

মামুদ গাঁওয়ানের অবদান

মাহমুদ গাওয়ান ছিলেন পঞ্চদশ শতকের দাক্ষিণাত্যের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তিনি বাহমনী সুলতানির প্রধান উজির হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পারস্যে ১৪১১ সালে জন্ম নেওয়া এই দূরদর্শী শাসক ও পণ্ডিত পরবর্তীকালে ভারত উপমহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে অবদান রাখেন। তার শাসনকাল বাহমনী সুলতানির অন্যতম উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়, যেখানে প্রশাসনিক সংস্কার, বাণিজ্যের প্রসার এবং শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা এক অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি এনে দেয়। মাহমুদ গাওয়ানের প্রশাসনিক সংস্কার ছিল অত্যন্ত সুগঠিত এবং সময়োচিত। বাহমনী সুলতানির আমলাতন্ত্রে তিনি দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠার সংমিশ্রণ ঘটান। শাসনব্যবস্থায় মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নীতি প্রতিষ্ঠা করে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধে সচেষ্ট হন। তার প্রশাসনিক সংস্কার বাহমনী সুলতানিকে একটি সংগঠিত ও কার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও গাওয়ান আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস চালান। আদালতে স্বচ্ছতা এবং আইনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য তিনি একাধিক বিধিবিধান প্রবর্তন করেন। দুর্নীতি দমন ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কঠোর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন এবং রাজকোষের হিসাবপদ্ধতি উন্নত করেন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিক থেকে মাহমুদ গাওয়ানের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বাণিজ্যের প্রসারে গুরুত্ব দেন এবং বাহমনী সুলতানিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত করতে সচেষ্ট হন। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলসহ বিভিন্ন স্থানে তার কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা বাহমনী অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলে। শিল্প ও কারিগরি পণ্য, বিশেষ করে বস্ত্র, চিনামাটি ও ধাতবশিল্পের উন্নয়নে তিনি উৎসাহ প্রদান করেন।

মাহমুদ গাওয়ানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বিদ্যাচর্চার প্রসারে তার অসামান্য ভূমিকা। বিদারের বিখ্যাত মাদ্রাসা তার প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়, যেখানে পারস্য, মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীরা একত্র হয়ে জ্ঞানচর্চা করতেন। মাদ্রাসাটি কেবল ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল না, বরং দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত এবং সাহিত্যচর্চারও এক অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এটি তার বিদ্যানুরাগী মানসিকতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তবে তার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বাহমনী সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ শাহের দরবারে কিছু বিদ্বেষপরায়ণ অভিজাতের প্ররোচনায় গাওয়ানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনে। সেই অভিযোগে ১৪৮১ সালে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর বাহমনী সুলতানি দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে বিভক্ত হয়ে বিদর, গলকোণ্ডা, বিজাপুর ও আহমদনগর নামে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। গাওয়ানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর গুরুত্ব এতটাই ছিল যে, তার অনুপস্থিতিতে বাহমনী সুলতানি টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়।

তার জীবন ও কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাহমুদ গাওয়ান ছিলেন একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক, দক্ষ প্রশাসক, কূটনীতিক এবং শিক্ষানুরাগী পৃষ্ঠপোষক। তিনি যে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন, তা শুধু বাহমনী সুলতানির সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং পরবর্তী যুগের বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা সুলতানদের প্রশাসনিক নীতিতে তার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তার মর্মান্তিক পরিণতি।

মাহমুদ গাওয়ান বাহমনী সুলতানির প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তার শাসন কালে বাহমনী ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বাহমনী সুলতানি ছিল ইসলামী

রাষ্ট্র, অন্যদিকে বিজয়নগর ছিল হিন্দু সাম্রাজ্য। ফলে এই সংঘর্ষ ছিল কেবল রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দখলদারিত্বের লড়াই নয়, বরং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংঘাতেরও প্রতিফলন। এই সংঘাতের মূল কারণ ছিল দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা। বাহমনী সুলতানি এবং বিজয়নগর উভয়ই দাক্ষিণাত্যের কৌশলগত ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। বিশেষত, রায়চূড় দোয়াব (কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চল) এবং গোয়ার মতো বন্দরনগরী এই দুই শক্তির মধ্যে বারবার সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্য, বিশেষত কৃষ্ণদেব রায়ের শাসন কালে, বাহমনী সুলতানির বিরুদ্ধে একাধিক সামরিক অভিযান চালায়। মাহমুদ গাওয়ান বাহমনী সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করতে নানা কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি মজবুত করেছিলেন, সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করেছিলেন এবং বিজয়নগর বাহিনীর আগ্রাসন প্রতিহত করতে বিভিন্ন সামরিক কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন। তবে এসব প্রতিরক্ষামূলক উদ্যোগ সত্ত্বেও বাহমনী বাহিনী বিজয়নগরের সামনে একাধিকবার বিপর্যস্ত হয়। বিজয়নগরের সামরিক শক্তি এবং দক্ষ কৌশলবিদ সেনাপতিরা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হন।

ধর্মীয় দিক থেকেও এই সংঘাত এক গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ নেয়। বিজয়নগর সাম্রাজ্য একদিকে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর চেষ্টা করছিল, অন্যদিকে বাহমনী সুলতানি ইসলামী শাসনের ধারাকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। বিজয়নগর বাহিনী দখলকৃত অঞ্চলে মসজিদ ধবংস করত, মুসলিম প্রশাসকদের উৎখাত করত এবং সেখানে হিন্দু মন্দির ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটাত। অন্যদিকে, বাহমনী শাসকরাও নিজেদের ইসলামী পরিচিতি সুসংহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পরেও বাহমনী-বিজয়নগর সংঘাত অব্যাহত থাকে। এই দ্বন্দ্ব দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবিত করে এবং পরবর্তী যুগে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ও বাহমনী সাম্রাজ্যের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। এই সংঘাত শুধু বাহমনী সুলতানি ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বই ছিল না, বরং এটি দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখানে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামরিক অভিযান এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন একত্রে প্রবাহিত হয়েছে। মাহমুদ গাওয়ানের শাসন কালে বাহমনী সাম্রাজ্য অনেক বাধার সম্মুখীন হলেও তিনি এই সংকট মোকাবিলায় তার কৌশলী প্রশাসন ও সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, যা তাকে দাক্ষিণাত্যের অন্যতম দক্ষ শাসক ও নীতিনির্ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

বাহমনি রাজ্যের পতন

বাহমনি সুলতানির পতনের কারণগুলি মূলত অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই সুলতানির শাসনকাল জুড়ে একের পর এক সমস্যা জন্ম নিয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত এর পতনের দিকে পরিচালিত করেছিল। এই রাজ্যের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ক্রমাগত গৃহযুদ্ধ। বাহমনি সাম্রাজ্যে মোট আঠারো জন সুলতানের শাসনকালে বারো জনই নিজেদের অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। রাজদরবার ষড়যন্ত্রে পূর্ণ ছিল, যেখানে আমির ও উমরাহরা নিজেদের স্বার্থে চক্রান্তে লিপ্ত থাকতেন। এই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে সুলতানির ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট আইন না থাকাও অন্যতম প্রধান দুর্বলতা ছিল। প্রত্যেক সুলতানের মৃত্যুর পর সিংহাসনের দাবিদার একাধিক ব্যক্তি উঠে আসত, ফলে তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বসৃষ্টি হতো। এর ফলে রাজ্যের প্রশাসন প্রায়শই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ত এবং সামরিক শক্তির অপচয় ঘটত। বাহমনি সুলতানির সামাজিক গঠনও অভ্যন্তরীণ বিভক্তির জন্য দায়ী ছিল। এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পারস্য ও তুরস্ক থেকে আগত মুসলিম আমিরগণ, যারা ভারতে বসবাস শুরু করেছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীও প্রশাসনে অংশীদার হওয়ার দাবি তোলে। এর ফলে ভারতীয় মুসলিম ও বিদেশি মুসলিমদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়, যা রাজ্যের স্থিতিশীলতাকে ক্ষুণ্ন করে।

এই সাম্রাজ্যের কিছু সুলতান ধর্মীয় উগ্রনীতি অনুসরণ করেছিলেন, বিশেষ করে তাদের হিন্দু প্রজাদের প্রতি। বাহমনি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিল হিন্দু, কিন্তু শাসকেরা প্রায়শই তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করতেন। এই দমনমূলক নীতির ফলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, যা ক্রমশ বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয়। পররাষ্ট্রনীতির দিক থেকেও বাহমনি শাসকগণ সুপরিকল্পিত কোনো কৌশল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। তারা আশপাশের রাজ্যগুলোর প্রতি এক শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করতেন। মালওয়া, খাণ্ডেশ, গুজরাট, তেলেঙ্গানা ও বিজয়নগরের মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাহমনিদের সম্পর্ক সর্বদা উত্তপ্ত ছিল। একাধিক ফ্রন্টে যুদ্ধ পরিচালনার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ক্ষয় হতে থাকে, যা শেষ পর্যন্ত তাদের পতন ত্বরান্বিত করে।

প্রাদেশিক গভর্নরদের হাতে অত্যধিক ক্ষমতা অর্পণ করাও এই সাম্রাজ্যের এক দুর্বল দিক ছিল। এই গভর্নরদের কর সংগ্রহ ও স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যা তাদের স্বায়ত্তশাসনের পথ প্রশস্ত করে। কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হওয়ার সুযোগে এই গভর্নররা নিজেদের স্বাধীন

শাসক হিসেবে ঘোষণা করতে শুরু করেন, যার ফলে বাহমনি সাম্রাজ্য কয়েকটি ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সামাজিক বৈষম্যও বাহমনি সুলতানির পতনে বড় ভূমিকা রাখে। রুশ পর্যটক আফনাসি নিকিতিন, যিনি ১৪৭০-১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিদারে অবস্থান করেছিলেন, উল্লেখ করেছেন যে বাহমনি আমিররা অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন, অন্যদিকে সাধারণ জনগণ ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাত। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে জনসাধারণকে করের বোঝা বইতে হতো, কিন্তু শাসকশ্রেণি এই সম্পদ নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যয় করত। এর ফলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, যা শেষ পর্যন্ত শাসনের ভিতকে দুর্বল করে তোলে। এই সমস্ত কারণ মিলিয়ে বাহমনি সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। গৃহযুদ্ধ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব সাম্প্রদায়িক বিভক্তি, পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতা, গভর্নরদের অতিরিক্ত ক্ষমতা ও সামাজিক বৈষম্যের মতো সমস্যা একত্রে কাজ করে এই শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে এক শতকেরও কম সময়ে ধ্বংস করে দেয়।